লালন শাহ ফকির

মুহম্মদ আবদুল হাই

লালন শাহ ফকীর

মুহম্মদ আবদুল হাই

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, সিলেট
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

হিজরী ১৪০০ বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

www.pathagar.com

লালন শাহ ফকীর :

মুহম্মদ আবদুল হাই

ই. ফা. প্রকাশনা : ৩০৩

প্রথম প্রকাশ :

মে, ১৯৮০

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭

রজর, ১৪০০

প্রকাশনায় :

হাফেজ মঈনুল ইসলাম

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

৬৭, পুরানা পল্টন

ঢাকা—২

মুদ্রণে :

পূর্ববঙ্গ প্রেস

২, জিন্দাবাহার ২য় লেন,

ঢাকা—১

মূল্য : ১·০০

LALAN SHAH FAKIR : The life-sketch of Lalan Shah Fakir, written by Mohammad Abdul Hye in Bengali and published by the Islamic Cultural Centre, Sylhet, a branch of the Islamic Foundation Bangladesh, Dacca, to celebrate the commencement of 1400 Al-Hijra.

Price : Tk. 1·00

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

লালন শাহ ফকীরের নাম ও গানের সাথে বাংলাদেশের জনসাধারণ ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। অথচ তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে খুব কম লোকই জানেন। বাউল কবি হিসেবেই তিনি সাধারণ্যে পরিচিত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কবিদের মধ্যে আত্মপরিচয় দানের যে উৎসাহ দেখা যায়, লালনের মধ্যে তা নেই। জীবন সম্পর্কে তাঁর এই ঔদাসীন্য থেকে বুঝা যায়, একনিষ্ঠ সাধনাই তাঁকে আত্মপরিচয় বিবৃতিতে নিরাসক্ত ও নিরস্ত করেছে। তাঁর ধর্ম সাধনার মূলে ছিল মানবপ্রীতি। মানব জীবনকে তিনি জাতি, ধর্ম, মানব দেহের অভ্যন্তরে বিশ্ব স্রষ্টার অধিষ্ঠান। প্রকৃতির রহস্য লীলায়, ফুলের সৌরভে, শিশুর হাসিতে—সর্বত্রই তিনি বিরাজমান।

লালন ছিলেন মুসলিম ও হিন্দু ঐতিহ্য সম্পর্কে ভূয়োদর্শনজাত জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর গান, বাণী ও উক্তিতে মুসলিম সমাজ ও জীবনধারার ঐতিহ্যগত ছাপ বিদ্যমান। তাঁর গানে আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার, কুরআনের জ্ঞান এবং হিন্দু পুরাণের যথেচ্ছ প্রয়োগ ক্ষমতা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। তাঁর গূঢ় তত্ত্বমূলক গানের মধ্যে তিনি এখনও আমাদের মাঝে বেঁচে আছেন। তাঁর গানের মধ্যে মানুষ অপার্থিব জীবনের সন্ধান পায়, ক্ষণিকের তরে হলেও পার্থিব জীবনের অসারতা সম্পর্কে চিন্তা করে—এখানেই লালনের সার্থকতা।

লালনের জীবন দর্শন সম্পর্কে গভীরভাবে অনুধাবন করার প্রয়োজন রয়েছে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই পুস্তিকাখানি প্রকাশ করা হল।

www.pathagar.com

বাংলার বাউল কবিদের মধ্যে লালন শাহই সুবিখ্যাত। তাঁর সমকক্ষ বাউল কবি কি হিন্দু কি মুসলমান কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায় না। আল্লাহ্‌র পথে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন বলে তাঁকে 'ফকীর' বলা হয়। তিনি তাঁর ভক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং বাংলা সাহিত্যে লালন ফকীর নামেই সমধিক পরিচিত।

বাংলার লোক কবিদের মধ্যে লালন ফকীর যত বড় কবি, ঠিক সেই পরিমাণেই তাঁর নাম, জাতি-ধর্ম, জনস্থান ও জন্ম-মৃত্যুর তারিখ ইত্যাদি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। আজও কোনো গবেষক এই সম্পর্কে কোনো অকাট্য স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেন নি। তাঁর জাতি-ধর্ম ও জন্মস্থান সম্পর্কে যে সব মত প্রচলিত আছে একে একে আমরা তা আলোচনা করছি।

কেউ বলেন, লালন হিন্দু, কেউ বলেন মুসলমান। 'বাংলার বাউল ও বাউলগান' (১৩৬৪) রচয়িতা উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের মতে "পূর্বতন নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া (বর্তমানে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলা) মহকুমার অন্তর্গত কুমারখালী থানার অধীন কুষ্টিয়া হইতে চার পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব কোণে গোরাই নদীর তীরবর্তী ভাঁড়ারা গ্রামে লালনের জন্ম হয়।"

কুষ্টিয়া কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের তরুণ অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর 'বাউল কবি লালন শাহ' পুস্তিকায় (১৯৬৩) লালনের জন্মস্থান যশোর জেলার কুলবেড়ে হরিশপুর গ্রাম ব'লে উল্লেখ করেছেন। আনোয়ারুল করিম নিজে যশোরের অধিবাসী। তিনি এই অঞ্চলের প্রবীণ লোকদের কথার উপর নির্ভর ক'রে লালনের জন্মস্থান যশোর ব'লে দাবী করেছেন। শুধু তাই নয়; প্রবীণ ব্যক্তিদের মতানুসারে তিনি লালনের পিতার নাম দবিরুল্লাহ্ শাহ্ কিংবা মলম শাহ্ বলতে চান।

www.pathagar.com

তাঁদের কাছ থেকে তিনি জানতে পেরেছেন, লালনের নাকি আরো দু'ভাই ছিলেন। তাঁদের একজনের নাম আলম শাহ্ আর একজনের নাম কলম শাহ্। বড় ভাই আলম শাহ্ কলকাতায় শ্রমিকের কাজ করতেন।

অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন, উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখ তাঁর পূর্ববর্তী জীবনীকার লালনকে হিন্দু কুলোদ্ভব ব'লে বর্ণনা করেছেন। তাঁর জন্মগত পূর্ণ নাম লালন চন্দ্র। বংশগত উপাধি কেউ বলেন রায়, কেউ বলেন কর, কেউ বলেন দাস। সম্ভবতঃ তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন।

বলা হয়, বিয়ের পর তিনি তীর্থযাত্রা করেন। নবদ্বীপের নিকটে পথে দুরারোগ্য বসন্ত রোগে আক্রান্ত হ'লে তাঁর সঙ্গী সাথীরা তাঁকে সেখানেই পরিত্যাগ করে যান। এক মুসলমান মহিলা সেখানে পানি নিতে এসে লালনকে অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তাঁরা স্বামী স্ত্রী মিলে তাঁকে নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। এই মুসলমান দম্পতি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁদের সেবা শুশ্রূষায় লালনের জীবন রক্ষা পায়। এর পর তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ইসলামের বিধি-নিষেধ ও ক্রিয়া-কর্মের সঙ্গে পরিচিত হন। কিছুকাল পর তিনি বাড়ী ফিরে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলেন। তাঁর স্ত্রী এই প্রস্তাবে সম্মত হননি। তাঁর মা তাঁকে বাড়ীতে রাখবার প্রয়াস ক'রে ব্যর্থ হন। আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁর ঘোর বিরোধিতা করতে থাকেন। ফলে, তিনি বাড়ীঘর ছেড়ে ভব-ঘুরে সাজেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি কুমারখালীর কাহার ব্যবসায়ী সিরাজ সাঁইয়ের সংস্পর্শে আসেন।

সিরাজ সাঁই সূফী সাধক এবং একজন কামেল লোক ছিলেন। এই সিরাজ সাঁইয়ের কাছ থেকেই লালন ফকীরী হাসেল করেন। ফকীরী লাভ করার পর তিনি কুষ্টিয়ার ছেঁওড়িয়া গ্রামে আসেন এবং সেখানে গভীর বনের মধ্যে সাধনায় লিপ্ত থাকেন। বনের ফলমূল খেয়ে সে সময়ে তিনি জীবন ধারণ করতেন। এই ভাবে সাধনা করার সময় তিনি ধ্যান-মগ্ন অবস্থায় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে গান গাইতেন। লোকে ক্রমে ক্রমে তাঁর কথা জানতে পেরে তাঁর আশ্রমে একটি কুটীর তৈরী ক'রে দেয় এবং খাবার-দাবার পাঠাতে থাকে। এখানেই তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। পরে তিনি এক মুসলমান তন্তুবায় শ্রেণীর মহিলার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে এই আশ্রমেই বাস করতে থাকেন। তাঁর কোনো সন্তানাদি হয়নি। তবে নদীয়া, ফরিদপুর, যশোর, পাবনা প্রভৃতি জেলায় তাঁর অগণিত শিষ্য-

www.pathagar.com

প্রশিষ্য ছড়িয়ে রয়েছে। প্রতি বছর নির্দিষ্ট দিনে লালনের এই আশ্রমে একটি বড় উৎসব হয়। তাতে দেশবিদেশ থেকে বহুলোকের সমাগম হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার লালনের ছেঁওড়িয়ার এই আশ্রমে একটি পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র তৈরী করে দেন।

লালনের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ নিয়েও কম বিতর্ক নেই। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে তাঁর জন্ম ১১৮১ সালে—ইংরেজী ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে; অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন সাহেবের মতে ১১৮২ সাল মোতাবেক ইংরেজী ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে।

লালনের মৃত্যুর তারিখ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে ১২৯৭ সাল, ১লা কার্তিক, ইংরেজী ১৮৯০, ১০ই অক্টোবর। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ১১৬ বৎসর। মনসুর উদ্দীন সাহেবের মতে ১২৯৯ সাল অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দ।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং মনসুর উদ্দীন সাহেবের মধ্যে লালনের জন্ম-মৃত্যুর তারিখের যে ব্যবধান তা এমন কিছু নয়। আমার ও মনসুর উদ্দীন সাহেবের যুগ্ম সম্পাদনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'হারামণি' ৫ম খণ্ডে (১৯৬১) আমিও লালনের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ যথাক্রমে ১৭৭৪ ও ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দ ব'লে গ্রহণ করেছি। এই বিষয়ে সকলেই একমত যে, লালন দীর্ঘজীবী ছিলেন।

লালন হিন্দু ছিলেন, না মুসলমান ছিলেন উপরোক্ত আলোচনায় তার কোনো ফয়সালা হ'লো না। তাঁর জন্ম-বৃত্তান্ত ও পরবর্তী ঘটনাবলী কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। তিনি হিন্দু বা মুসলমান যে ঘরেই জন্ম গ্রহণ করুন না কেন, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি মুসলমানই ছিলেন—আমাদের মতো শরীয়তপন্থী মুসলমান না হ'লেও সূফী সাধক বে-শরাহ ফকীর হিসেবে যতটুকু মুসলমান থাকা যায় তিনি তাই ছিলেন। তবে তাঁর রচিত এ গানটি থেকে মুসলমানের ঘরেই যে তাঁর জন্ম হয়—এমন দাবী অনেকেই করেছেন:

সব লোকে কয় লালন ফকীর হিন্দু কি যবান (যবন)
লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান।

www.pathagar.com

একই ঘাটে আসা যাওয়া
একই পাটনী দিচ্ছে খেওয়া
কেউ খায়না কারো ছোঁয়া
বিভিন্ন জল কে কোথায় পান?
বেদ পুরাণে করেছে জারি
যবনের সাঁই হিন্দুর হরি
আমি বুঝতে নারি
দুই রূপ সৃষ্টি করলেন কি তার প্রমাণ?
বিবিদের নাই মুসলমানি
পৈতা যার নাই সেওতো বাওনি
বোঝরে ভাই দিব্য জ্ঞানী
লালন জানো খাতনার জাত একখান।

জন্ম অবধি লালনের মুসলমানত্বের প্রমাণ সাপেক্ষে 'লালন জানো খাতনার জাত একখান' এই শেষের পংক্তিটি অনেকে উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। আভ্যন্তরীণ প্রমাণাদি থেকে তিনি মুসলমান ঘরেই জন্ম গ্রহণ করেছেন বলে মনে হলেও তিনি হিন্দু না মুসলমান ছিলেন তা নিয়ে তর্ক করা বৃথা। তার কারণ লালন বাহ্যত হিন্দু বা মুসলমান হিসেবে বাঁচতে চাননি, জীবন ধারণও করেন নি। তিনি ছিলেন সাধক ও মরমী কবি। সহজ কথায় বাউল কবি হিসেবেই তাঁর খ্যাতি।

সহজিয়া নাথপন্থ, মরমীবাদ ও বাউল প্রভৃতি শব্দের ঐতিহ্য এবং ব্যাখ্যা অত্যন্ত জটিল। মধ্যযুগে বৌদ্ধ ধর্মের বিকৃতি এবং হীনযান ও মহাযান প্রভৃতি শাখার ভাঙনের কালে এই দেশের নিম্ন শ্রেণীর অধিবাসীদের মধ্যে নানা গুহ্য সাধনপন্থী লোকের সৃষ্টি হয়। উন্নত ভাবাদর্শ ও মহৎ চিন্তা কল্পনার অধিকারী এরা ছিল না। এসব নেড়া-নেড়ীর দল গ্রাম-বাংলায় সমাজের নীচের তলায় অত্যন্ত কদর্যভাবে জীবন যাপন করতো। বৈদিক, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন সাধনার ধারা মিলে-মিশে এসব বিকৃত রুচির মত ও পথ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এর ফলে সংস্কৃতি ও সাধনার ক্ষেত্রে কিছু যে ভালো ফল ফলেনি তা নয়। বাউল মতবাদও এমনি এক সাধনার ফল।

www.pathagar.com

'বাউল ধর্ম সাধনা একটি গুহ্য যোগ ক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গুহ্য সাধনার সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে।' মধ্যযুগে সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত 'বাউল' শব্দটি 'বাহ্যজ্ঞানহীন' 'উন্মাদ' 'স্বাভাবিক চেতনাশূন্য' প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হ'য়ে এসেছে। অনেকে 'বাউল' শব্দটিকে 'বাতুল' শব্দের প্রাকৃত রূপ ব'লে মনে করেছেন। কেউ কেউ 'বাউল'কে 'আকুল' শব্দজাত 'আউল' শব্দেরও সমার্থবোধক বলতে চান। তাঁরা মনে করেন 'বাউল' সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান সাধকরা 'আউল' বা 'আউলিয়া' হিসেবে গণ্য।

বাউল সাধকদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই দেখা যায়। মুসলমান বাউলেরা 'বে-শরাহ' ফকীর। 'বে-শরাহ' অর্থ শরীয়ত বা আনুষ্ঠানিক ইসলাম ধর্ম বহির্ভূত। নামায, রোযা, হজ, যাকাত সংক্রান্ত বিধি-বিধান এঁরা পালন করেন না। বাউলেরা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে মরমী। তাঁরা আধ্যাত্মবাদী। মুসলমান বাউলদের ওপর সূফী প্রভাব পড়ায় তাঁরা আরও বিশেষভাবে তত্ত্বান্বেষী। তাঁরা সচেতনভাবে নিজেকে জানার প্রয়াস করেন এবং নিজেকে জানার ভেতর দিয়ে আল্লাহ্‌কে জানতে চান।

লালন এমনি এক সিদ্ধ বাউল কবি। তিনি যে লেখাপড়া জানা শিক্ষিত লোক ছিলেন এমন কথা কেউই বলেন না। তিনি 'উম্মি' বা নিরক্ষর ছিলেন। তাঁর সাধারণ জ্ঞান ছিল প্রখর। হিন্দু ও মুসলমন ঐতিহ্য সম্পর্কে ভূয়োদর্শন-জাত জ্ঞানের তিনি অধিকারী ছিলেন। অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তিনি তত্ত্বজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শিক্ষিত মুসলিম কবি আলাওল এবং বর্তমান কালের নজরুল ইসলামের মতো হিন্দু ও মুসলিম কৃষ্টির সারবস্তু তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর বাণী, গান ও উক্তিতে হিন্দু ও মুসলিম সমাজ ও জীবনধারার ঐতিহ্যগত ছাপ সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। প্রাক-আজাদী যুগের বাংলাদেশে বিশেষভাবে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজের নীচের তলার হিন্দু ও মুসলিম সাধকেরা হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির একটি যে মিলন সাধনের ক্ষেত্র রচনা করে চলেছিলেন লালন প্রমুখ বাউল সাধকের গানে তার আশ্চর্য স্বীকৃতি দেখতে পাই।

এ ছাড়াও একালের কবি নজরুল ইসলাম যেমন পৃথকভাবে হিন্দু সংস্কৃতি অবলম্বন ক'রে কালিকাদেবী সম্পর্কে শ্যামা সংগীত ও সাধুকীর্তনাদি রচনা করেছেন আবার ইসলামী ভাবাদর্শ সম্বলিত মুসলিম ইতিহাসের ছোট-খাটো ঘটনাকে অসংখ্য গানে ও গজলে ধরে দিয়ে গেছেন, বাউল কবি

www.pathagar.com

লালন ফকীরও তেমনি হিন্দু ও মুসলিম ঐতিহ্যের বিষয় নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে গান রচনা করেছেন।

লালন ফকীর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তত্ত্বজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন বলে জীবন ও জগতের পরিচিত পরিবেশ সম্পর্কে গভীর ধ্যান-ধারণাজাত উপলব্ধির কথা অত্যন্ত সহজ ভাষায় সাবলীল ভঙ্গীতে বলতে পারতেন। তাঁর কাছে 'মানুষ'ই ছিল সব চেয়ে বড়। চণ্ডীদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'---এ অনুভূতি সহজ ভঙ্গীতে লালনের এই গানটিতে ধরা পড়েছে :

এমন মানব জনম আমার আর কি হবে
মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে।
অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
শুনি মানবের উত্তম কিছু নাই,
দেব দেবতাগণ
করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে।
কত ভাগ্যের ফলে না জানি
মনরে পেয়েছে এই মানব তোরণী
বেয়ে যাও ত্বরায় সুধারায়
যেন ভারা না ডোবে
এই মানুষে হবে সাধুজ্জ ভজন
তাইতো মানুষরূপ গঠলে নিরঞ্জন।
এবার ঠকলে আর
না দেখি কিনার
অধীন লালন তাই ভাবে।

বাউলেরা মানুষকে পূজা করেন না কিন্তু মানুষকে জানাই তাঁদের প্রধান সাধনা। বাউল আল্লাহ্‌কে ছেড়ে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের রহস্য উদঘাটনে ব্যাপৃত। তাঁরা সেই রহস্য উদঘাটন করেন এই দেহের সাধনার ভেতর দিয়ে। তাঁদের মতে 'যা আছে ব্রাহ্মাণ্ডে, তা আছে দেহ ভাণ্ডে।' সুতরাং দেহকে জরীপ ক'রেই তাঁরা তাদের দেহের অধিকারী মনের মানুষ মনের মাঝে 'করেন অন্বেষণ'। তাদের মনের মানুষ, আলোকের

www.pathagar.com

মানুষ "আল্লাহ্' বিশ্ব প্রভু এ মানব দেহের মধ্যেই বাস করেন। খুঁজে ফিরে শুধু তাঁকে ধরতে পারা চাই। বাউল শ্রেষ্ঠ লালন এই সম্পর্কে অপরূপ কথা বলেছেন :

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মন বেড়ী দিতাম তাহার পায়।
আট কুঠরী নয় দরজা আঁটা
মধ্যে মধ্যে ঝলকা কাটা,
তার উপর আছে সদর কোঠা
আয়না মহল তায়।
মন তুই রৈলি খাঁচার আশে
খাঁচা যে তোর তৈরী কাঁচা বাঁশে
কোন্‌দিন খাঁচা পড়বে খসে
লালন কয়, খাঁচা খুলে
সে পাখী কোনখানে পালায়।

রবীন্দ্র নাথের মধ্যেও এ অনুভূতির প্রতিধ্বনি শুনতে পাই :

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর
আমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।

বাউল কবি হিসেবে লালন ফকীর একদিকে যেমন দেহের সাধনা করেছেন সূফী প্রভাব বশতঃ অন্যদিকে তেমনি আল্লাহ্‌কে পাবার আশায় মুর্শিদেরও আরাধনা করেছেন। এই মুর্শিদ তাঁর কাছে 'ইনসানে কামেল' হযরত মুহম্মদ (সঃ)। সূফী সাধনায় পীর বা গুরুবাদের প্রয়োজন হয় আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করার জন্য। যথারীতি আল্লাহ্‌কে পাওয়ার সাধনা করতে পারলে দেখা যায় আল্লাহ্ প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ দেহের ঘাড়ের শিরা-উপশিরার চেয়েও তার নিকটবর্তী। কিন্তু তা উপলব্ধি করবার শক্তি অর্জন করতে হ'লে গুরু, পীর তথা মুর্শিদলাভ করতে হয়। লালন তাঁর সাধনায় হযরত মুহম্মদকে (সঃ) মুর্শিদরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কাছে 'আহাদ' (এক আল্লাহ্) এবং 'আহমদ' (যিনি প্রশংসিত) অর্থাৎ হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর মধ্যে কেবল 'মিম' হরফেরই ব্যবধান। সুতরাং তাঁর বিশ্বাস নবীকে ধরতে পারলে আল্লাহ্‌কে পাওয়া দুষ্কর হয় না :

www.pathagar.com

আকার কি নিরাকার সাঁই রাব্বানা
আহাদের আহমদের বিচার হৈলে যায় জানা।
হায়রে আহমদ নামেতে দেখি
মিম হরফ লেখে নবী
মিম গেলে আহাদ বাকী
আহমদ নাম থাকে কিনা।
খুঁজিতে বান্দার দেহে
খোদা সে রয় লুকাইয়ে
আহাদে মিম বসাইলে
আহমদ নাম হয় কিনা।

অর্থাৎ আল্লাহ্ সাকার কি নিরাকার এখানে তা ভেবে দেখতে বলা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কোন্ হরফের কি তত্ত্ব তাও জানতে হবে। হযরত মুহম্মদ (স:) যিনি আল্লাহ্র নবী তাঁর অপর নাম আহমদ। আহমদ শব্দটি লিখতে আলেফ, হে, মিম ও দাল ঐ চারটি হরফের প্রয়োজন হয়। এর ভেতর থেকে মিম হরফটি বাদ দিলে পাওয়া যায় আহাদ অর্থাৎ আল্লাহ্কে; আবার আহাদ শব্দটির মধ্যে মিম হরফটি যোগ করলে পাওয়া যায় হযরত মুহম্মদ (স:)-কে।

লালন সূফী মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেও যথার্থ সূফী ধর্মাবলম্বী ছিলেন না। তিনি মূলত বাউল তত্ত্ববাদী তথা মরমী কবি ছিলেন। অন্য কথায় তিনি তত্ত্বরসিক বা Mystic ছিলেন। আল্লাহ্কে পাই পাই করেও যেন পাচ্ছেন না। তাঁকে জীবনব্যাপী সন্ধান করাই যেন তাঁর মূল লক্ষ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—নিম্নের পদগুলোর মতো বহুপদে তার পরিচয় বিবৃত:

কোথা আছে রে দীন দরদী সাঁই
চেতন গুরুর সঙ্গ লয়ে খবর কর ভাই।
চক্ষু আঁধার দেলের ধোকায়
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়
কি রঙ্গ সাঁই দেখেছে সদাই
বসে নিগম ঠাঁই।

www.pathagar.com

এখনো না দেখলাম যারে
চিনবো তারে কেমন ক'রে?
ভাগ্যেতে আখেরে তারে
দেখতে যদি পাই।
সুমঝে ভবে সাধন করো
নিকটে ধন পেতে পারো
লালন কয় নিজ মোকাম ধোড়ো
বহু দূরে নাই।

অথবা

আমি একদিনও না দেখলাম তারে
আমার বাড়ীর কাছে আরশী নগর
(ও) এক পরশী বসত করে।
গ্রাম বেড়িয়ে অগাধ পানি
ও তার নাই কিনারা নাই তরণী
পারে।
আমি বাঞ্ছা করি
দেখবো তারি
আমি কেমনে সে গাঁয়ে যাইরে।।
বলবো কি সেই পড়শীর কথা
ও তার হস্ত পদ স্কন্ধ মাথা
নাইরে।
ও সে ক্ষণেক থাকে শূণ্যের উপর
আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে।
পড়শী যদি আমায় ছুঁতো
আমার যম যাতনা যেতো
দূরে।
আবার, সে আর লালন একখানে রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁকরে।

লালন ফকীর এই ধরনের হাজার হাজার গান রচনা করেছেন। এই সব গান তিনি যে বসে বসে লিখতেন তাও নয়। তাঁর অধিকাংশ গানই অনুভূতিলব্ধ। ভাবোন্মত্ত অবস্থায় তিনি গান গাইতেন। আর তাঁর

www.pathagar.com

ভক্ত ও শিষ্যেরা সে গান মুখস্থ করে নিত, টুকে রাখতো। গ্রাম্য গায়েনদের মুখে মুখে সমগ্র বাংলাদেশে এমন কি পশ্চিম বাংলাতেও লালনের গান ছড়িয়ে গেছে। নদীয়া, যশোর, খুলনা, পাবনা, ফরিদপুর প্রভৃতি মধ্য ও নিম্নবঙ্গের জেলাগুলোতেই লালনের গানের প্রাধান্য দেখা যায়। লালনের শিষ্য-প্রশিষ্য ও ভক্ত সম্প্রদায়ের মুখে গীত হ'তে হ'তে তাঁর গান নানাভাবে বিকৃত হয়েছে; এই বিকৃতি শুধু যে উচ্চারণ ঘটিত তা নয়, অনেক সময়ে ঠিকমতো মুখস্থ না করতে পেরে গায়েনেরা তাতে হয়তো নিজে নিজে শব্দও যোজনা করেছে। আবার এক মুখ থেকে অন্য মুখে যেতে যেতেও বহু গান পরিবর্তিত হয়েছে। খ্যাতিহীন কোনো গায়ক আত্মতৃপ্তি লাভ করার জন্যে গান রচনা ক'রে লালনের ভনিতা দিয়ে বসেছে এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই।

সে যা হোক, লালনের গানগুলো লোকমুখে গীত হ'তে হ'তে লোক-গীতির মতো এখন জাতীয় সম্পদে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে আউল বাউল প্রভৃতি শাখার লোক কবির অভাব নেই। পাগলা কানাই, মদন বাউল, গগন হরকরা, বিশাভুঁই মালী, শীতালং শাহ প্রমুখ অগণিত লোক-কবির নাম আমরা জানি। একালে যে ভাবে তথ্যানুসন্ধান স্পৃহা বেড়েছে তাতে আরও লোককবি আবিষ্কৃত হচ্ছেন। কিছু কিছু ক'রে তাঁদের গানও উদ্ধার করা হচ্ছে। কিন্তু লালনের গান যতই বিকৃত হোক বিজ্ঞ পাঠকের কাছে তার কোনটা আসল ও কোনটা নকল তা সহজেই ধরা পড়ে। তার কারণ লালনের মতো দিব্য দৃষ্টি আর কোনো বাউল তথা লোককবির ছিল না। কতকালের কোন্ সাধনায় তাঁর অন্তর কি ভাবে যে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছিল তা বাইরের লোকের জানবার কথা নয়, কিন্তু তাঁর লোকোত্তর চেতনা সমৃদ্ধ হৃদয় থেকে গভীর ধ্যান ও জ্ঞানের কথা, ইহকাল, পরকাল, জাতি-ধর্ম, সম্প্রদায়, মানুষ এবং স্রষ্টা সম্পর্কিত বিবিধ জটিল তত্ত্ব ও রহস্য-কথা কত সাবলীল রচনা ভঙ্গীতে যে ধরা পড়েছে তাঁর রচিত গানগুলোর সঙ্গে নিবিড় পরিচয় থাকলে তা সহজেই বোঝা যায়। তাঁকে তাই তত্ত্বজ্ঞানী মহাকবি বলতে হয়। সহজ সরল বাংলা শব্দের মধ্যে কত যে রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে তাঁর গানের শব্দ প্রয়োগও অনায়াসে বয়ন কুশলতাই সেই সাক্ষ্য বহন করছে। এমন ঝরঝরে, নির্ভরে তদ্ভব শব্দ প্রয়োগের কারু-কলা আর কোনো লোককবির গানে দেখা যায় না। লালন তাঁর সমসাময়িক এবং পূর্ব ও পরবর্তীকালের

www.pathagar.com

অন্যান্য লোক-কবি থেকে এখানেই বিশিষ্ট তারদাবী করেন। সেজন্যই লালন শ্রেষ্ঠ বাউল ও লোককবি।

তাঁর আরবী ফার্সি শব্দের ব্যবহার, কুরআন জ্ঞান এবং হিন্দু পুরাণের যথেচ্ছা প্রয়োগ ক্ষমতা দেখলে বিস্মিত হ'তে হয় এবং তখন তিনি যে নিরক্ষর ছিলেন একথা বিশ্বাস হয় না।

লালনের গান এখনও সম্পূর্ণ সংগৃহীত হয়নি। ১৩২২ সনে রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী' পত্রিকায় লালন ফকীরের কুড়িটি গান প্রকাশ করেন। তখন থেকে শিক্ষিত বাঙালী জনসাধারণের বাউল গান সম্পর্কে কৌতূহল বৃদ্ধি পায়। বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথের সহকর্মী অধ্যাপক ক্ষিতি-মোহন সেনও বাউল গান সম্পর্কে নানা আলোচনা করেন। এরপর অধ্যাপক মনসুর উদ্দীনের নামই বাউল গানের সংগ্রাহক হিসেবে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এযাবৎ পাঁচখণ্ড হারামণি প্রকাশ করেছেন। তাতে লালনের অনেক গান সংগৃহীত হয়েছে। অধ্যাপক উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের 'বাংলার বাউল ও বাউল গানে' (১৯৫৭) লালনের ১৬০টি গান প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫৮ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় 'লালন গীতিকা'। এতে লালনের ৪৬২টি গান মুদ্রিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ১৩৬৫ সনের (১৯৫৮) বর্ষা সংখ্যা সাহিত্য পত্রিকায় মনসুর উদ্দীন সাহেব লালনের ২৯৭টি গান প্রকাশ করেন। উক্ত বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'হারামণি'তে (৫ খণ্ড) লালনের আরও ২২৫টি গান স্থান পেয়েছে। মুহম্মদ কামাল উদ্দীন সংকলিত লালন গীতিকা (১ম খণ্ড) ১৯৬২ এবং অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম সম্পাদিত 'বাউল কবি লালন শাহ' পুস্তিকায় (১৯৬৩) যথাক্রমে তাঁর আরও ১০০ ও ১০৪টি গান মুদ্রিত হয়েছে। বাংলা একাডেমী তাঁর বহু গান সংগ্রহ করিয়েছেন। এসব গান প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

ছেঁওড়িয়ায় লালনের আশ্রমে একটি গবেষণা ও পাঠাগার নির্মাণ করা বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে। আশা করা যায় এখানে অদূর ভবিষ্যতে লালনের গান সংগৃহীত হবে—তাঁর সম্পর্কে গবেষণা হবে। এর ফলে ব্যাপকভাবে তথ্য সংগৃহীত হ'লে লালনের কাব্য প্রতিভা এবং বাংলাদেশের সাহিত্যে এমন কি সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তাঁর দানের পূর্ণ স্বরূপ এবং তাঁর চিন্তা ভাবনা, ধর্মমত ও জীবন দর্শনের তথ্যবহুল একটি সামগ্রিক ছবি পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন তিনি যে একজন নগণ্য লোককবি হিসেবেই থাকবেন তাও নয়। এ যাবৎ বিভিন্ন গবেষকের চেষ্টায় এবং তাঁর গান থেকে আমরা যা জানি তাতেও তিনি শক্তিমান ও শ্রেষ্ঠ বাউল কবি হিসেবেই বাংলা ভাষাভাষী জনসাধারণের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এই যাবৎ প্রকাশিত তাঁর কবিতা ও গানই তাঁকে জানার সবচেয়ে বড় উপাদান। এগুলো শুনলে তিনি হিন্দু না মুসলমান, তাঁর জন্মস্থান কুষ্টিয়ার ভাঁড়ারা গ্রামে না যশোরের কুলবেড়ে হরিশপুরে এসব কোনো কথা মনে আসে না। তাঁর দিব্য জ্ঞান, রহস্য-রসিকতা এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতির স্বরূপ লক্ষ্য করে আমরা বিস্মিত হই আর তাঁর রচনা শৈলীর অত্যাশ্চর্য সরলতায় হই মুগ্ধ। তখন অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন সত্যদ্রষ্টা এক মহান কবি ব'লেই তাঁকে আমরা জানতে পারি।

লালন যে একজন মহান ও শ্রেষ্ঠ বাউল কবি ছিলেন রবীন্দ্রনাথও তার স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। বৃদ্ধ লালনের সঙ্গে তরুণ রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়েছিল এবং তিনি লালনের ভাব-সাধনার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে বাউলদের ধর্ম সাধনা বৈশিষ্ট্যের সমর্থন পাওয়া যায়—'মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ জ্ঞানে, কর্মে, ভাবে যে পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণেই সেই মনের মানুষকে পাই—অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাইনে। মানুষের কিছু দুর্গতি আছে, সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে অর্থাৎ আপনাকেই পর ক'রে দিয়ে। আপনাকে তখন টাকায় দেখি। খ্যাতিতে দেখি, ভোগের আয়োজনে দেখি। এই নিয়েই তো মানুষের যত বিবাদ, যত কান্না। সেই বাইরে বিক্ষিপ্ত আপনহারা মানুষের বিলাপ গান একদিন শুনেছিলাম পথিক ভিখারীর মুখে—

'আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যেরে,
হারায়ে সেই মনের মানুষে তার উদ্দেশ্যে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।'

সেই নিরক্ষর গাঁয়ের লোকের মুখেই শুনেছিলাম :

'তোরই ভিতর অতল সাগর—'

www.pathagar.com

সেই পাগলই গেয়েছিলো :

মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ।'

সেই অন্বেষণেরই প্রার্থনা বেদে আছে :—"আবিরা বীর্য এধি—পরম মানুষের বিরাটরূপে যার স্বতঃ প্রকাশ আমারই মধ্যে তার প্রকাশ সার্থক হোক।"*

বাউল কবিদের মধ্যমণি লালন শাহ ফকীরের ওপর রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি পড়েছিল। তিনি তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন এবং তাঁর ভাবধারায়ও যে কিছু প্রভাবান্বিত হননি এমন নয়। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, গীতালি ও গীতিমাল্য প্রভৃতি সংগীতার্ঘ্য কাব্যগুলোতে লালনের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিকতার একটি সগোত্রতা লক্ষ্য করা যায়। এই সগোত্রতা অবশ্য প্রভাবজাত ততটা নয়, যতটা চিন্তা ও ভাব-সাধনার ঐক্যজাত। তবে একথা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ লালন সম্পর্কে কৌতূহলী হয়েছিলেন এবং শ্রেষ্ঠ বাউল কবি হিসেবে তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন বলেই তাঁর প্রতি বাঙ্গালী কাব্যামোদী ও শিক্ষিত জনসাধারণের বিশেষভাবে দৃষ্টি পড়ে। তার ফলে দীর্ঘকাল ধরে আলোচিত হ'তে হ'তে তিনি তাঁর স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হন। নইলে কতকাল যে তিনি লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকতেন বলা যায় না।

কুষ্টিয়ার ছেঁওড়িয়া অঞ্চল রবীন্দ্রনাথের জমিদারীর মধ্যে ছিল। শোনা যায় তিনিই সচেষ্ট হয়ে ছেঁওড়িয়ায় লালনের কবরটি বাঁধিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

*মানুষের ধর্ম : রবীন্দ্র রচনাবলী, বিংশ খণ্ড পৃঃ ৩৯০

IFP—79—80—P2552—10250—10.4.1980

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ